২১-০৭-২০১৬ প্রাতঃমুরলী ওঁমশান্তি "বাপদাদা" মধুবন

"মিষ্টি বাচ্চারা, -তোমাদের এমন নেশা (খুশী/শখ) হওয়া দরকার যে,- বাবা এসেছেন, আমাদেরকে বিশ্বের রাজ্য-ভোগের মালিক বানাতে। তাই তো আমরা ওনার সন্মুখে বসে আছি"

প্রশ্নঃ- কর্মের গুহ্য গতিকে (গোপন রহস্যকে) জানতে পারলে, তখন কি এমন পুরুষার্থ তোমাদের অবশ্য করণীয় ?

উত্তরঃ- স্মরণে থাকার পুরুষার্থ। কারণ এটা তাদের জানা আছে যে, স্মরণের যোগ দ্বারাই পুরোনো সব হিসাব- নিকাশ শেষ হয়ে যায়। আত্মারা জানে যে তারা যদি তাদের পুরোনো হিসাব-নিকাশ, কর্মভোগ ইত্যাদির পরিশোধ না করে, তবে তাকে সাজা তো পেতেই হবে আবার তার জন্য তাদের পদও ভ্রষ্ট (নিম্ন) হয়ে যাবে। তার পুনর্জন্মও সেই হিসাবেই হবে।

ওঁম শান্তি! বাচ্চাদের তখন অপার খুশী হয়- যখন দেখে যে, তারা বাপদাদার সন্মুখে এসে বসেছে। আর এটাও বাচ্চারা জানে যে, ৫-হাজার বছর পরে আবার শিববাবা ব্রহ্মার দেহে অবস্থান করছেন। কিন্তু তা কি করতে ? তাই তো বাচ্চাদের এই এত খুশী জেগেছে, যেহেতু সব বাচ্চারাই জানে যে, বাবা তাদেরকেই স্বর্গের মালিক বানাতে এসেছেন। সেই নিমিত্তেই বাবা আমাদেরকে উপযুক্ত বানাচ্ছেন। তাই আমাদের তমোপ্রধান থেকে সতোপ্রধান হবার যুক্তি বার-বার বলছেন। আবার সেই যুক্তিও হলো খুবই সহজ। খুবই সহজ ভাবে স্মরণের পদ্ধতি তিনি তার বাচ্চাদের শেখাচ্ছেন। অজ্ঞানী (শিশু) কালে, অর্থাৎ বাবার বাচ্চা হলে, তখন বাবারা ভাবে- আমার উত্তরাধিকারী হয়েছে। আর তোমরা জানো যে, এই সময়েই বাবা এসে আমাদের অ্যাডপ্ট করেন (দত্তক নেন) । যদিও এমনিতেই তো তোমরা সবাই শিববাবারই বাচ্চা। কিন্তু বাবা কিভাবে ওনার নিজের করে নেন, যাতে উনি আমাদেরকে সবকিছু শোনাতে পারেন, আর আমরাও তা ওনার থেকে শুনতে পারি। শিববাবা এই ব্রহ্মার দেহের সাহায্য নিয়েই বলেন - "আমিই তোমাদের সেই পিতা। যে আমি তোমাদেরকে স্বর্গের মালিক বানিয়ে থাকি।" তোমাদের আত্মারা যে পতিত অবস্থায় এখানে আসছে তাতে করে তারা- না তো মুক্তিতে, আর না জীবনমুক্তি ধামে যেতে পারে। প্রকৃত অর্থে তোমরা সবাই কিন্তু একই বাবার বাচ্চা। তাই তোমাদের সবাইকেই বাবার সম্পত্তি ভাগ অবশ্যই নেওয়া উচিত। যদিও তোমরা অনেক সংখ্যায়, অনেক-বাচ্চা, তবুও তা আরও বৃদ্ধি হতে থাকে। যেহেতু বাবা দত্তক নিতেই থাকেন। বাবা বলেন -"হে আত্মারা এখন তোমরা সবাই তো আমার সন্তান হয়েছো। তাই নিজেদেরকে রুহু অর্থাৎ আত্মা ভাবো, যেহেতু আমরা এই বাবাকে পেয়েছি, যাকে আমরা অর্ধকল্প ধরে স্মরণ করে এসেছি। একথা কখনও ভুলো না কিন্তু। অর্ধেক-কল্প ধরে তোমাদের আত্মারা এই শরীর দ্বারাই এইভাবে স্মরণ করে এসেছে, আর বলেছে - "হে পতিত পাবন, দুঃখ-হর্তা, সুখ-কর্তা।" যেহেতু এখন এটা রাবণের রাজ্য। তবুও তাদের কেউ কেউ এখনও ভাবে যে, আমারা তো অনেক সুখেই আছি, আমার কত অনেক ধন-সম্পত্তি আছে, এত সব মিল-কারখানা ইত্যাদি কত কিছু আছে, কিন্তু বাস্তবে -এ সব তো অতি অল্প কালের জন্য। শেষ কালেতে তো খুবই ত্রাহি-ত্রাহি করতে হবে। যখন অন্তিমের সেই দুঃখের পাহাড় ভেঙ্গে পড়বে। তখন, এতসব ধন-সম্পদ কয়েক সেকেন্ডেই শেষ হয়ে যাবে। আবার- বাবার থেকেও আশীর্ব্বাদী- বর্ষা প্রাপ্ত হয় সেকেন্ড মাত্র মূহুর্তেই। একমাত্র এই

বাবাই বলতে পারেন- সেকেন্ডের মধ্যেই তোমাদেরকে সেই স্বর্গের বাদশাহী দেই। এই পুরনো দুনিয়ার শেষ তো হতেই হবে। তাই তখন কত লড়াই লাগবে, ভয়ঙ্কর প্রাকৃতিক দুর্যোগও হবে। তবেই তো তারপর তা পরিষ্কার হবে। সেই উদ্দেশ্যেই তোমাদের আত্মারাও এখন পবিত্র হচ্ছে। 'বাপ-দাদা' দুজনেই এখন তা বুঝতে পারছেন যে, বাচ্চারা এর জন্য কতই না পরিশ্রম করছে, বাবার থেকে আশীর্ব্বদী-বর্ষা পাবার জন্য। এতে কায়িক পরিশ্রম যদিও খুবই অল্প দিলেই হয়। মূল কথা হলো, নিজেকে আত্মা ভেবে বাবাকে স্মরণ করা। যেহেতু এই রুহানী বাবা হলেন নিরাকার, আমরা আত্মারাই ওনাকে এভাবে ডেকে থাকি। বাবা বলেন তোমাদের আত্মা যে পতিত অবস্থায় আছে তা আবার পবিত্র পাবন হবে কি করে। পতিত-পাবন তো এই এক ও একমাত্র বাবা-ই। জলের নদী পতিত-পাবনী হলে তো ঝট করে গিয়ে ডুব দিয়ে চলে আসলেই হয়ে যেত। তাই যদি হতো, তবে এত গঙ্গা স্নান করেও এই এত বিশাল সংখ্যক পতিত কেন ? রাত-দিন এই বলে গীত গাইতে থাকে- "পতিত-পাবন সীতারাম"- অর্থাৎ এত সব যে 'ভক্ত'-রা আছে, অর্থাৎ 'সীতা'-রা আছে, তাদের সবারই রক্ষক এই এক রাম, অর্থাৎ পরমপিতা পরমাত্মা। উনি এ রকমেরই পতিত-পাবন, -যিনি পতিদেরও পতি। উনি এই ধরাধামে এলে, তবেই সবাইকে পতিত থেকে পাবন বানান। তাই তো এখন বাবা সেভাবেই বলছেন, -"কেবলমাত্র আমার শ্রীমত অনুসারেই তোমাদেরকে চলতে হবে। সেখানে আর অন্য কারো মতে চলতে পারো না।" ভক্তি-মার্গের ওরা তো ভাবে যে, ভক্তির দ্বারাই ভগবানকে পাওয়া যাবে। তবে আবার এরকম কেন বলবে যে, ভক্তের রক্ষা করতে ভগবান আসে। ভক্তের আবার কি আপদ-বিপদ আসবে যে উনি রক্ষা করবেন ? রক্ষা তখন করা যায় যখন কোনও আপদ-বিপদ আসে। বাবা বলেন, এই সব ধ্যান-ধারণার জন্য তোমাদের আজ এত দুর্গতি হয়েছে। এটা হলো (রৌরব) আতঙ্কের নরক, যেখানে সবাই দুঃখী ও রোগী হয়ে কাটাচ্ছে। প্রতি ঘরেই দেখো, কি নিদারুণ অবস্থায় আছে তারা। কেবল দুঃখই দুঃখ! এইজন্যই তো তারা ডাকতে থাকে, বাবা আমাদের দুঃখ দূর করে, সুখ দাও। একদা এই ভারতেই সদা-সর্বত্রই কেবল সুখই ছিল, যা এখন কেবল দুঃখে পরিণত হয়েছে। পুঁথি-পত্র, শাস্ত্রাদি সবেতেই এই ভারতেরই কথাই বলা আছে। যেহেতু, আর অন্য সব খণ্ড (দেশ) তো থাকে পৃথক আর আলাদা। আর এই ধরাধামে অন্যেরা তো আসেই অনেক পরে। তাই তারা কেউ পায় ৬০ জন্ম, আবার কেউ বা তার থেকেও কম জন্ম নেয়। আর ৮৪ জন্ম পায় একমাত্র দেবতা ধর্মের আত্মারা। তাই তো সেই হিসাবে অর্ধকল্প বাদে যে সব আত্মারা আসবে তাকে ৮৪ থেকে অর্ধেক জন্ম নিতে হবে। এরকম নয় যে সবাই এই ৮৪-র চক্রে আসে। সাধারণ মনুষ্যরা তো মনে যা আসে তাই বলে। কিন্তু, এখন তোমরা বাচ্চারা -বাবার দেওয়া এই অবিনাশী জ্ঞান রত্নে তোমাদের ঝুলি ভরছো। এই রত্ন তো অনেকই মূল্যবান। আর বাবা তা বোঝানও অনেক সহজ ভাবে। বাবা বলেন তোমরাই তো এতদিন ধরে ডেকে এসেছো, হে পতিত-পাবন তুমি এসে আমাদেরকে পবিত্র-পাবন বানাও। তাই তো বাবা স্বয়ং এসেছেন। এখন তোমরাই ভাবো যে তোমরা পাবন হলেই তো স্বর্গের (সত্যযুগের) মালিকও হবে। সেই উদ্দেশ্যেই শিববাবা আমাদেরকে পাথরবুদ্ধি (নির্বুদ্ধি) থেকে পারশবুদ্ধি (বুদ্ধিমান), অর্থাৎ পাথরনাথ থেকে পারশনাথ বানাতে এসেছেন। তাই তো ভক্তি-মার্গের চিত্রগুলি সব পাথরের (নির্বুদ্ধির) রূপে হয়ে আছে। নির্বুদ্ধিতার কারণেই পরে কেবল মাথাই ঠুকতে হয়। বাবা বলেন- এই পর্যায়ে তোমরা যতই পরিশ্রম কর না কেন, তাতে তোমাদের লাভ কিছুই হয় না। আগে তো তোমরা কত বলি দিতে। তাতে কি কোনও লাভ হয়েছে ? খুব বেশি হলে তাতে কেবল দেব-দেবীর সাক্ষাৎকার হবে। আবার যে কে সেই অবস্থা। পুরো কল্পে এই পতিত-পাবন বাবা একবারই আসেন- তাও এই সঙ্গমেতেই। সত্য-যুগেতে তো ভক্তি-মার্গের কোনও কথাই হয় না। বাবা তো বলেন না যে কারও গলা কাটো।

এটা করো। ওটা করো। কিন্তু, ভক্তি-মার্গেতে অনেক প্রকারের কি কি না করে থাকে। আগে যখন দেব-দেবীদের সামনে মনুষ্যেদেরই বলি দেওয়া হতো। বাবা বলেন- সেই তোমরাই তো যখন সভ্য ছিলে, তখন তো তোমরাই দেবতা ছিলে। আর এখন সেই তোমরাই কত নির্বুদ্ধির হয়ে পড়েছো। তোমাদেরকেই তো স্বর্গের সেই (বাদশাহি) রাজ্যভোগ দিয়েছিলাম। কত সোনা, হীরে, জহরতের মহল ছিল, কত প্রচুর ধন-সম্পদ ছিল। তা সেগুলি তোমরা কি করেছো ? যার অভাবে এখন তোমরা কত দুঃখী হয়ে পড়েছো। তোমরাই আসলে একদা সেই দেবী-দেবতা ধর্মের আত্মা ছিলে। যা এখন কেবল তোমরা রজো থেকে তমোতে এসে পৌঁছেছো। এই তোমরাই তো কখনও দেবী-দেবতা ধর্মের আত্মা ছিলে, তাহলে আবার নিজেদেরকে হিন্দু কেন বলো ? অন্য আর সব ধর্মের মানুষরা কিন্তু, তারা নিজের- নিজের ধর্মকেই মানে। প্রকৃত অর্থে -ধর্ম তো একটাই। তবুও যেমন মুসলমানদের মুসলিম ধর্ম, ক্রিশ্চানদের ক্রিশ্চান ধর্ম -এই ভাবেই তা চলে আসছে। কিন্তু, তোমাদের বেলায় এমনটা কেন হয়েছে ? যেখানে তোমরা এতো অনেক সুখী, পবিত্র, সম্পূর্ণ নির্বিকারী ছিলে ? যা বর্তমানে এখন কত বিকারি হয়ে পড়েছো। কারোরই তা জানা নেই- যে একদা এই আমরাই সম্পূর্ণ নির্বিকারী ছিলাম- আবার সেই আমরাই এখন সম্পূর্ণ বিকারি কি করে হয়েছি ? ৮৪ জন্ম নিতে নিতে সতো থেকে তমোতে এসে পৌঁছেছি। যা বর্তমানে এখন একদমই তমোপ্রধান পতিত হয়ে পড়েছি। কল্পের চক্রে তো সত্যযুগ থেকে কলিযুগ অবশ্যই আসবে। সব ধর্মকেই সতো- রজো- তমোতে আসতেই হয়। তাদের বৃদ্ধিও হতে থাকে। তোমরাও সেই কল্প-বৃক্ষের ঝাড়ের অন্তর্গত। ঝাড়েতে দেখো- শেষ প্রান্তে ব্রহ্মা দাঁড়িয়ে আছেন, আবার ঝাড়ের উপরের চূড়ার উঁচুতেও সেই ব্রহ্মাই। যিনি ৮৪ জন্মের শেষে একেবারে নিম্নে দাঁড়িয়ে আছেন। তোমরাও নীচে ব্রাহ্মণেরা বসে আছো, যেহেতু তোমরাই আবার শেষকালে পতিত শূদ্র হয়েছো। আবার নীচে এসে সেই রাজযোগ-ই শিখছো। ফলে যে তোমরা এতদিন শূদ্র ছিলে, এখন তারাই আবার ব্রাহ্মণে পরিণত হচ্ছো। এটাই খুব সুন্দর ভাবে বোঝার কথা। এভাবে ঝাড়েতে খুব ভালো করে বোঝানো আছে। এখন তোমরা রাজযোগের তপস্যাই করছো, যা আসলে তোমাদের নিজেদেরই স্মৃতিচিহ্ন । এই যে মন্দির তৈরী হয়, যদিও তা জড় স্থাপত্য, সেটাই তোমাদের চৈতন্যের প্রমাণ স্বরূপ। যেমন দিলওয়ারা মন্দির। যদিও ওটা জড়, কিন্তু তাতে চৈতন্যেরই প্রকাশ। কিন্তু, সত্যযুগেতে এসব থাকে না। এই সময় কালে তোমরা নিজেদেরই সেই স্মৃতি-চিহ্নগুলি দেখে থাকো। ব্যবহারিক অর্থে তোমরাই সত্যি-সত্যি দিলওয়ারা মন্দিরে চৈতন্য স্বরূপে বসে আছো। অপর দিকে আবার স্বর্গের স্থাপনা কার্যও হচ্ছে। আবার যখন সেই স্বর্গতে পৌঁছবে, তখন সেখানে এই মন্দির আদি কিছুই থাকবে না। এখানে (দিলবাড়া মন্দিরে) মাম্মা, বাবা আর আমরা বাচ্চারাই বসে আছি। হুবহু এটা -তোমাদেরই চিত্রকে মন্দিরে রূপ দিয়েছে। নামটাই তো রাখা হয়েছে মধুবন, চৈতন্য দিলওয়ারা মন্দির। আবার যখন ভক্তি-মার্গ শুরু হবে তখন আবার এই মন্দির আদি এসব বানাতে থাকবে। এই বাবাই তোমাদের অনেক ধনবান বানিয়ে থাকেন, তাই তো তোমরা আবার তাঁর মন্দির বানাও। শিবের মন্দির কিন্তু একটা-দুটো বানানো হয় না, অনেক সংখ্যায় বহুজনেই তা বানায়, যে যার যোগ্যতা ও শক্তি অনুসারে তা বানায়। তোমরা তো জেনেই গেছো যে, একদা তোমরাই পূজ্য ছিলে, আর তারপর আবার পূজারী হয়েছো। এই শিববাবা, যিনি তোমাদেরকে এত ধনী বানান, তাই ভক্তি-মার্গেতে এসে তোমরাই আবারও ওনার মন্দির বানাবে। এই সব কথার মর্মার্থ এখন কেবল মাত্র তোমরাই জানো। অতএব এখন আবার সেই ভাবে পুরুষার্থের দ্বারা রাজারও রাজা হওয়া উচিত তোমাদের। যেমন সত্যযুগে তাদের বলা হয়ে থাকে মহারাজা। আর ত্রেতাতে বলা হয় রাজা। তারপর আবার যখন এই দুনিয়া পতিত হয়ে পড়ে, তখন মহারাজারাও পতিত, আর রাজারাও পতিত হয়ে পড়ে। আর ভক্তি-মার্গের ওরা তখন সেই নির্বিকারী মহারাজাদের প্রতিমূর্ত্তিকেই মন্দির

বানিয়ে সেখানে প্রতিষ্ঠিত করে পূজা করে। প্রথম দিকে শিবের মন্দির বানায় তারপর অন্যান্য দেবী-দেবতাদের মন্দির বানায়। তারা নিজেরাই নিজেদের মন্দির বানিয়ে নিজেদেরকেই পুজা করে। এই ভাবেই ৮৪ জন্মের কর্ম-কর্তব্য পালন করে। এই তোমরাই অর্ধেককল্প পূজ্য আবার অর্ধেককল্প সেই তোমরাই পূজারীতে পরিণত হও। অথচ মানুষ ভাবে যে, ভগবান নিজের ইচ্ছায় পূজ্য আবার নিজের ইচ্ছায় পূজারী হন। সবকিছুই তিনি নিজেই দিয়ে থাকেন, আবার নিজেই তা ছিনিয়ে নেন। আচ্ছা উনিই যদি তা দিয়ে থাকেন আবার নিয়েও নেন, এটাই নিয়ম হলে, তাহলে তোমাদের এত সব চিন্তা কেন হয়। তখন তবে তোমরা তো নিমিত্ত মাত্র হয়ে যাবে। সেক্ষেত্রে তো তোমাদের কান্না-কাটির প্রশ্নই আসে না। বাবা বসে আত্মাদেরকে এগুলিই বোঝাচ্ছেন। যার ফলে চেষ্টায় এখন তোমরা আত্ম-অভিমানী হতে পারো, অবশ্য তা ক্রম-অনুসারে। কেউ কেউ তো একদমই বাবাকে স্মরণই করেন না। তারা মোটেই কখনও দেহী-অভিমানী থাকেন না। এখানে তো কত ভাবেই তা বোঝানো হয়- আরে তোমরা তো আত্মা, পরম-আত্মা স্বয়ং তোমাদেরকে পড়াচ্ছেন। আত্মাতেই তো সংস্কারের প্রভাব থাকে। এই আত্মাই ব্যারিস্টার, উকিল, ইত্যাদি হয়ে থাকে, আত্মাই আবার ম্যাজিস্ট্রেট, শাসক ইত্যাদি হয়। আগামীতে কি হবে ? যদি আত্মা গভীর ভাবে বাবাকে স্মরণ করতে পারে, তবেই তো সে অমরলোকে গিয়ে জন্ম নেবে। এই মৃত্যু-লোকে আর সে দ্বিতীয় জন্ম নেবে না। তবুও যদি কিছু হিসাব-নিকাশ বাকী থেকে থাকে তো, সেই সাজা তাকে খেতেই হবে। ফলে কর্মভোগ ভুগে তা শেষ করতেই হবে, যে কারণে তার আর উঁচুপদ প্রাপ্তি হবে না। কর্মের এই গুহ্য গতির রহস্যকেই বাবা বসে বাচ্চাদেরকে বোঝান। বাচ্চারা তো এটা ভালভাবেই জানে যে, সত্যযুগ হলো সতোপ্রধান। সব কিছুই ওখানে সতো-প্রধান অবস্থায় থাকে। কথিত আছে যে, কৃষ্ণও গরু চড়াতেন ? আচ্ছা, রাজারা কি কখনও গরু চড়াবেন ? এরকম কথা তো বিশ্বাস যোগ্য হতেই পারে না। আবার এরকমও বলা হয়েছে সত্যযুগের গরু এতই ভাল হয়ে থাকে যে, তাকে কামধেনু আখ্যা দেওয়া হয়। জগতের আম্বা (মা) সরস্বতীই তো সেই কামধেনু। যিনি ২১ জন্মের জন্য সকলের মনকামনা পূরণ করে থাকেন। তোমরাও সেই কামধেনু। কিন্তু তাকেই গরুর নাম রেখেছে। অর্থাৎ যে অনেক দুধ (জ্ঞান) দেয়। রাজাদের রাজধানীতে খুব উন্নত মানেরই গরু থাকে। যেখানে বর্তমানের রাজাদের কাছেই এরকম ভাল-ভাল অনেক উন্নত গরু আছে, তবে তা স্বর্গতে কিরকম আরও সুন্দর হবে! ওখানে কোন দুর্গন্ধ আদি একদমই কিছু হয় না। সেটাই এখন বাবা বাচ্চাদের বলছেন যে, আমি এসেছি তোমাদেরকে সুগন্ধ ফুল বানিয়ে সাথে নিয়ে যাবো। আমাকে তো ডাকাই হয়, ওহে পতিত-পাবন তুমি আসো। পতিত দুনিয়ায়, পতিত শরীরে অবস্থান করো। যেহেতু বর্তমান দুনিয়াটাই হলো পতিত, আর ওটা (সত্যযুগ) হলো পবিত্র পাবন পরীদের রাজ্য। যে আগামী উপহার আমরা দেখতেও পাই। তোমরাও এখন সেই পতিত থেকে এরকমের পবিত্র-পাবন পরীদের মতনই হবে। সত্যযুগী দেবতাদের তো দৈবী-ই বলা হয়। আর সূক্ষ্ম-বতনবাসীরা হলো- পরীরা। অতএব এখন তোমাদেরকে পরীদের মতন পবিত্র হতে হবে। বাবা কত সহজ ভাবে এই শিক্ষা দেন। এখানে যখন কেউ আসে, তা কোনও বাইরের মিত্র-সম্বন্ধী, ঘর-দুয়ার, ব্যবসা-বানিজ্য আদির স্মরণ মোটেই করবে না। মনে রাখবে তোমরা বাবার কাছে এসেছো। এখানে এসেছো কেবল যোগের বল অর্জন করতে, তাই মনোযোগ সহকারে এতেই লেগে থাকা উচিত। আচ্ছা ! "মিষ্টি, মিষ্টি (সিকীলধে) হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতার বাপদাদার স্মরণ সুমনের ভালবাসা আর সুপ্রভাত। রুহানি বাবার নমস্কার রুহানি বাচ্চাদেরকে।"

ধারণার জন্য মুখ্য সারঃ-

১) সাজা থেকে মুক্ত হবার জন্য পুরানো যত হিসাব-নিকাশ আছে, তা যোগবলের দ্বারা চুকিয়ে পবিত্র হতে হবে। নিমিত্ত মাত্র ভাবে থেকে সবকিছুই সামলাতে হবে। অন্য কোনও কিছুর ব্যাপারে চিন্তা করলে হবে না। কেবল আত্ম-অভিমানী হয়ে থাকলে, তবেই হবে।

২) বর্তমানের এই সময়টা অর্জন করার সময়। তাই ঘর-দুয়ার, ব্যবসা-বাণিজ্য, ইত্যাদি স্মরণে আনা উচিত নয় মোটেই। পরীর মতন হবার লক্ষ্যে এক ও একমাত্র বাবার স্মরণে থাকার নিমিত্তে সম্পূর্ণ সময়টাতেই পুরুষার্থ করে যেতে হবে।

বরদানঃ- সম্পূর্ণ সমর্পণের বিধি দ্বারা সর্বগুণ সম্পন্ন হবার পুরুষার্থের দ্বারা সদা বিজয়ী ভব (হও)।

সম্পূর্ণ সমর্পণ তাকেই বলা হয়, যার সঙ্কল্পতেও দেহ-অভিমান থাকে না । নিজের দেহের ভাবকে অর্পণ করে দেওয়া। আমি অমুক -এই সঙ্কল্পকেও অর্পণ করে সম্পূর্ণ ভাবে সমর্পিত যে হতে পারে, সেই সর্ব-গুণ সম্পন্ন হয়। তখন আর তার মধ্যে কোনও গুণেরই অভাব থাকে না। যে সব কিছুই সমর্পণ করে সর্বগুণ সম্পন্ন বা সম্পূর্ণ হওয়ার লক্ষ্য রাখে, এরকম পুরুষার্থীকেই বাপদাদা সদা বিজয়ী ভব-র বরদান দেন।

স্লোগানঃ- মনকে যে বশে (আয়ত্বে) রাখতে পারে, সে মন্মনাভব হয়ে থাকতে পারে।